মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এক দশক

'ফিরে দেখুন একাত্তর, ঘুরে দাঁড়াক বাংলাদেশ'

শামীম আল আমিন

মৃদুলার চোখে-মুখে ক্ষোভ, বেদনার আভা রাজীবের চেহারায়। মুক্তিযুদ্ধে নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ আর নিপীড়নের চিহ্ন দেখছে ওরা। অনন্য গৌরব ধরা পড়ে নন্দিনী, সামিয়া আর আবিরের অভিব্যক্তিতে, যখন তারা দেখতে পায় রাইফেল উঁচিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জানান দিচ্ছে 'আমরা মুক্ত'। ধানমন্ডির একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে 'মুক্তিযুদ্ধ' দেখতে এসেছে এরা। মাতৃভূমির বেদনা ও গৌরব দেখতে আসে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষ। আগামী প্রজন্মের সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের এই সেতুবন্ধ তৈরির অসামান্য দায়িত্বটি পালন করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আর আজ এ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ করছে তার অগ্রযাত্রার এক দশক।

একটি জাদুঘরের গড়ে ওঠা: মুক্তিযুদ্ধের বেদনা আর গৌরবকে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে একটি জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ রাষ্ট্রই নেবে—এমনটিই ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু স্বাধীনতার ২৪ বছর পেরিয়ে গেলেও রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নেয়নি। তখন আমরা আটজন এই জাদুঘরের উদ্যোগ নিই। এভাবেই একটি জাদুঘরের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব ডা. সারওয়ার আলী।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ডা. সারওয়ার আলী, আলী যাকের, সারা যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, মফিদুল হক, রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং আক্কু চৌধুরী এ জাদুঘরটির উদ্যোক্তা এবং ট্রাস্টি।

ডা. সারওয়ার আলী স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলছিলেন, প্রথমে শুধু বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণের ইচ্ছাই ছিল। পরে কেন্দ্রীয়ভাবে এ কটি জাদুঘর করার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ শিখা অম্লান জ্বালিয়ে জাদুঘরের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ রাশিদুল হাসানের নাতনি অর্চি।

জাদুঘরের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, শুরুতে তাদের সংশয় ছিল, মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারবেন কি না। শহীদ পরিবারগুলো মূল্যবান স্মারকগুলো তাদের হাতে তুলে দেবেন তো! অথচ সময়ের ব্যবধানে পাওয়া যায় ব্যাপক সাড়া। আর এ টাকেই সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন তারা। এ পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৭১৯টি স্মারক জমা পড়েছে এ জাদুঘরে। প্রতি মাসে কেউ না কেউ এসে বিরল সব স্মারক জমা দিয়ে যাচ্ছেন। দিনে-দিনে এটি সর্বজনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ফিরে দেখুন একাত্তর: মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশের সময় দেখা মিলবে জীর্ণ একটি গাড়ির—এ যেন এক টুকরো 'একাত্তর'। জীর্ণতাকে ম্লান করে দিয়ে গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটি। গাড়িটি ব্যবহার করতেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী।

জাদুঘরের ভেতরে প্রবেশের সময় দেয়ালে লেখা আছে 'ফিরে দেখুন একাত্তর, ঘুরে দাঁড়াক বাংলাদেশ'। আরেকটু এগিয়ে গেলে শিখা চিরঅম্লান জ্বলছেই। তার ওপরে লেখা রয়েছে, 'সাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি/সাক্ষী আকাশের চন্দ্রতারা/ভুলি নাই শহীদের কোনো স্মৃতি/ভুলব না কিছুই আমরা...।' পাশের বারান্দায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকা, সামনে কোনো এক বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাস্কর্য।

এরপর খোলা রয়েছে ইতিহাসের দরজা। সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেই জাতির অনন্য গৌরব আর অদ্ভুত এক ব্যথা স্পর্শ করবে।

ইতিহাসের দরজা: ইতিহাসের দরজা দিয়ে ভেতরে যাওয়া যাক। কী আছে এই জাদুঘরের ভেতরে? বাঙালির অতীত ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে ছয়টি গ্যালারিতে উপস্থাপন করা আছে এখানে। প্রথমটিতে আছে বাংলার অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র। দ্বিতীয় গ্যালারিতে পাকিস্তানি শাসনামলের শুরু থেকে ১৯৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত পরিক্রমণ। এখানকার স্মৃতি নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিধেয় অতি পরিচিত কোট, পায়জামা, রুমাল, পাইপ ও তামাকের বাক্স। এ স্মারকগুলো জাদুঘর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তৃতীয় গ্যালারিতে রশীদ তালুকদারের তোলা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের আলোকচিত্রের দৃশ্যসহ রয়েছে অসহযোগ আন্দোলন, ২৫ মার্চের কালরাত্রি, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা উপস্থাপনের চিত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেই ঘোষণার ধারণকৃত টেপের স্পুল, শরণার্থীদের দুরবস্থার চিত্র আর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণের চিত্র। গ্যালারি ৪-এ পাওয়া যাবে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া বীরদের ব্যবহৃত জিনিসের দেখা। শহীদ ডা. হুমায়ুন কবীরের বই, শহীদ এ এস এম হাবিবুল্লাহর ব্যবহৃত চশমা ও জামা-কাপড়, রাজশাহী পুলিশ সুপার শহীদ শাহ আবদুল মজিদের ব্যবহৃত হ্যাট, লাঠি ও পোশাক। শহীদ মামুন মাহমুদের নোট খাতা। আরও আছে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং এম মনসুর আলীর নানা স্মৃতিচিহ্ন। আছে মুক্তিযুদ্ধের পধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর লেখা নির্দেশনামা।

বারান্দায় রাখা আছে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত বাংলাদেশের মানচিত্র। পঞ্চম গ্যালারিতে রয়েছে সাধারণ মানুষসহ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনীর বীরত্বের নিদর্শন। আছে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের কিছু নমুনা। বিটলসের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর পোস্টার। সর্বশেষ গ্যালারি বহন করছে মহান অর্জনের গৌরব। বাংলার বীরযোদ্ধাদের আত্মদানের নানা পরিপ্রেক্ষিত। মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করা মুক্তিযোদ্ধাদের কঙ্কাল। আছে পরাজিতদের আত্মসমর্পণের অপূর্ব দৃশ্য।

মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে শেখা : আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে নানা ধরনের কার্যক্রম চালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এসবের উদ্দেশ্যই থাকে মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে শেখা। বলছিলেন ডা. সারওয়ার আলী।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা ঢাকা শহরের স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'আউটরিড কর্মসূচি' শুরু করে ১৯৯৭ সালে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকার ২৮৪টি স্কুলের ৭৫ হাজার ২৮১ জন শিক্ষার্থী এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। এক বছরে কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা পরে মিলিত হয় মুক্তির উৎসবে।

সারা দেশের মানুষের কথা মাথায় রেখে একটি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর করা হয় ২০০১ সালে। ৩৬০টি স্মারক নিয়ে এ জাদুঘর ছুটে চলে জেলা থেকে জেলায়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে নতুন এক কার্যক্রম গ্রহণ করে জাদুঘর। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের গুরুজন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পাঠাচ্ছে। এ পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি সাক্ষাৎকার পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহে শিক্ষার্থীরা কাজ করছে। সাধারণ মানুষের বীরত্ব আর আঞ্চলিক ইতিহাস উঠে আসছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে এসব সাক্ষাৎকার অনলাইনে দিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

জাদুঘরের রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গবেষণা বিভাগ। এ বিভাগে মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা সব ধরনের বই সংরক্ষিত আছে। আছে বিভিন্ন সময়ের সংবাদপত্রের ক্লিপিংস। আর গবেষণার কাজে এ বিভাগটি ব্যবহার করতে পারেন যে কেউ। জাদুঘরের নিজস্ব কয়েকটি সমৃদ্ধ প্রকাশনাও রয়েছে। চমৎকার একটি মিলনায়তন ও দৃষ্টিনন্দন ক্যাফে থিয়েটার জাদুঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বহুগুণ। রোববার বাদে যেকোনো দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে এ জাদুঘর।

আসুন, দেখুন আর হাত বাড়ান : দুটো খাত থেকে আয় আসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। নিজস্ব আয়ের মধ্যে রয়েছে দর্শনার্থীদের কাছে টিকিট বিক্রি, মিলনায়তন ও ক্যাফে থিয়েটার ভাড়া, 'কিয়স্ক'-এ (বিক্রয় কেন্দ্র) রাখা স্যুভেনির ও মুক্তিযুদ্ধের বই বিক্রি। এ ছাড়া রয়েছে জাদুঘরের জন্য সরকারের থোক বরাদ্দ। ১৯৯৯ সাল থেকে এ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া তিন ধরনের সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে অনেক দানশীল ব্যক্তি অনুদান দিয়ে থাকেন। এসব আয়ের মাধ্যমে চলছে জাদুঘরের কার্যক্রম।

'আনন্দ ভবন' নামে সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাড়িতে বর্তমানে জাদুঘরটি অবস্থিত। পরিসর অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ১৪ হাজারের বেশি স্মারকের মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৩০০ এখানে প্রদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে। তাই একটি স্থায়ী ভবনের প্রয়োজনীয়তা বড় বেশি অনুভব করছেন উদ্যোক্তারা। ফলে এ জাদুঘরটি তাকিয়ে আছে দেশপ্রেমিক মানুষদের দিকে। উদ্যোক্তারা বলছেন, আসুন, দেখুন আর হাতটা বাড়ান।